বুলেটিন নং: ১৯
বর্ষ ৭॥ সংখ্যা ৩
প্রকাশ কাল: ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১
শুভেচ্ছা মূল্য: ৮ ২ ॥ $1

# THE SWADHIKAR
# স্বাধিকার

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট( ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

# আসন্ন নির্বাচনে ইউপিডিএফ-এর মনোনীত ও সমর্থিত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

আগামী ১লা অক্টোবর দেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ইউপিডিএফ এই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। পার্টি ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনের দুইটিতে নিজ দলের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। প্রার্থী হচ্ছেন ইউপিডিএফ-এর প্রধান পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসা। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির দুই আসন থেকে। ইউপিডিএফ ছাড়াও আরো দু'একটি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী এই দুই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আসন্ন এই সংসদ নির্বাচন অনেক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তথাকথিত শান্তিচুক্তির পর এটাই প্রথম সাধারণ নির্বাচন। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ ১৫ বছর পর এবারে ভারত থেকে ফিরে আসা জুম্ম শরণার্থীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তৃতীয়ত, চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলনের সর্বপ্রধান ও অগ্রগামী শক্তি ইউপিডিএফ প্রথমবারের মতো এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। সেজন্য ইউপিডিএফ-এর জন্যও এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মোট কথা, আসন্ন নির্বাচন ইউপিডিএফ ও অধিকারহারা নিপীড়িত জনগণের জন্য এক চ্যালেঞ্জ ও একই সাথে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে পরীক্ষিত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার এক সুবর্ণ সুযোগ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে জনগণ শত বাধা বিঘ্ন, দমন পীড়ন ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হয়েছেন, অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সে একই জনগণ এবার পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যালট বিপ্লব ঘটিয়ে ইউপিডিএফ-এর পক্ষে রায় দেবেন।

কারণ, এক. বর্তমান সময়ে ইউপিডিএফ-ই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে অগ্রসর রাজনৈতিক দল। এই পার্টিই জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে। ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে যারা আছেন, তাদের রয়েছে দীর্ঘ এক যুগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাছাড়া, সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে এই পার্টিতে রয়েছেন সুবিশাল সুশৃঙ্খল কর্মিবাহিনী, যারা জনগণের সাথে ওতপ্রোতভাবে থেকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

দুই. ইউপিডিএফ-এর প্রধান নেতৃত্বে রয়েছেন এক সময়কার তুখোড় ছাত্রনেতা, পার্বত্য চট্টগ্রামে তরুণ যুব সমাজের আদর্শের প্রতীক প্রসিত বিকাশ খীসা। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে রয়েছে তার অসামান্য অবদান। তিনিই হচ্ছেন লোগাং লং মার্চের রূপকার। আপামর জনগণের কাছে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জনপ্রিয় করতে তার রয়েছে অনন্যসাধারণ ভূমিকা। সকল ঝড়ঝঞ্ঝা মোকাবেলা করে তিনি আন্দোলনে অবিচল রয়েছেন।

তিন. ইউপিডিএফ-ই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনের ভবিষ্যত। যদি জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে ইডাপাডএফ-ই হবে সেই আন্দোলনের ভ্যানগার্ড।

চার. পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শাসনামল দেখেছে। ভোগ করেছে স্বৈরাচারী এরশাদের চরম দুঃশাসন। গত দশ বছরে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মুখোশ খুলে পড়েছে। পাঁচ বছর বিরোধী দলের সংসদ সদস্য ও পাঁচ বছর সরকারী দলের সদস্য হয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য তারা কোনকিছু করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এলাকায় উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও হয়নি। জনগণের সুখ দুঃখের কথা সংসদে তোলা হয়নি। সেজন্য জনগণ এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন যে, সংসদে তাদের কথা তুলে ধরার জন্য দরকার একজন সুযোগ্য প্রার্থী। তারা এটাও উপলব্ধি করছেন যে, ইউপিডিএফ-এর মনোনীত প্রার্থীই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি শুধু আপামর জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বিশ্বস্ততার সাথে তুলে ধরে ক্ষান্ত হবেন না, বরং তিনি তাদের অধিকারের জন্য সংসদের ভিতরে লড়াই চালাতেও পিছপা হবেন না।

পাঁচ. আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত জুম্ম জনগণের বন্ধু নয়। এমনকি দেশের সাধারণ খেতে খাওয়া গরীব মেহনতি মানুষেরও বন্ধু নয়। এইসব দলের মনোনয়ন নিয়ে কোন জুম্ম প্রার্থী নির্বাচনে জয়যুক্ত হলেও সেই প্রার্থী জনগণের জন্য কিছুই করতে পারে না। বরং তাকেই সরকারের গণবিরোধী নীতি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হয়। সে কোনক্রমেই দলের শৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না। দল থেকে পদত্যাগ করলে বা বহিষ্কৃত হলে তার সংসদ সদস্যপদও বাতিল হয়ে যায়। বর্তমান বাংলাদেশ সংবিধান মোতাবেক এটাই নিয়ম।

ছয়. জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে পার্টি নেতৃত্বকে অনেক সময় ঝুঁকি নিতে হয়। বর্তমান সময়ে একমাত্র ইউপিডিএফ -এর যে কোন ধরনের বাস্তবসম্মত ঝুঁকি নেয়ার সময় ও সামর্থ্য রয়েছে।

সাত. ইডাপাডএফ-ই পারস্পারিক সম অধিকার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল জাতিসত্তার মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পার্টি জনগণের মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতিকেই অগ্রাধিকার দেয়।

রাজপথের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ইউপিডিএফ মনে করে পার্টি নেতৃত্বের আরো অনেক শেখা, জানা ও বোঝার রয়েছে। এই নির্বাচন হবে ইউপিডিএফ-এর জন্য ভবিষ্যতের ব্যাপক ও উত্তাল গণ আন্দোলনের ড্রেস রিহার্সেল। কাজেই নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করুন। গাছের ফল পেতে হলে পরিচর্যা করতে হয়। গাছ লাগালেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সার পানি দিতে হয়, আগাছা সাফ করে দিতে হয়। গরু ছাগলে যাতে নষ্ট করতে না পারে তার জন্য তদারকি করতে হয়। গাছটি বড় না হওয়া পর্যন্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়। তবেই ফল পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে সুফল পেতে হলে জনগণের আন্দোলনের শক্তি ইউপিডিএফ-কেও সেভাবে রক্ষা করতে হবে। যে গাছ বুড়ো হয়ে গেছে তাতে সার পানি দিলেও আর কোন ফল পাওয়া যাবে না। পরিচর্যা করলেও কোন লাভ হবে না। পরিশ্রম হবে নিরর্থক। অপরদিকে যে গাছটি এখন ছোট হলেও, তাকে পরিচর্যা করা হলে সে একদিন বড় হয়ে ফল দেবে।

বেশ কিছু ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও জেএসএস আন্দোলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কিন্তু অতীত কখনো ফিরে আসে না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন নতুন প্রজন্মের কাঁধে এসে পড়েছে। আর ইউপিডিএফ-ই হচ্ছে এই নতুন প্রজন্মের সবচেয়ে অগ্রসর প্রতিনিধি। এ সত্য আমরা যতই দ্রুত উপলব্ধি করতে পারবো, জনগণের জন্য ততই মঙ্গল হবে। ইউপিডিএফ রাজপথে লড়াই করেছে, এখনো করছে। এবার সংসদের ভেতরে লড়াই করতে হবে। রাজপথ গিরিপথ ও সংসদের ভেতরে একযোগে লড়াই চালাতে হবে। এতদিন সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে কথা বলার কেউ ছিল না। এবার এই সুযোগ হাত ছাড়া করা হবে চরম বোকামি। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনগণের কাছে আবেদন: ইউপিডিএফ-এর মনোনীত ও সমর্থিত প্রার্থীদের আপনাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। ❐

## প্রসিত বিকাশ খীসার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনালেখ্য

প্রসিত বিকাশ খীসা ১৯৬৬ সালের ১৫ এপ্রিল খাগড়াছড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অনন্ত বিহারী খীসা ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং পাহাড়ি ছাত্র সমিতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা রাখেন।

প্রসিত খীসা ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরিক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু প্রথম বর্ষ শেষে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হন এবং খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ও তার বন্ধুরা মিলে হুয়াং বোই-ও-বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন, যা খাগড়াছড়িতে স্কুল কলেজের বিদ্যানুরাগী ছাত্রছাত্রীদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৯৮৪ সালে খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। সে সময় দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তিনি ভূমিকা রাখেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কয়েকজন সহকর্মিকে নিয়ে রাডার নামে রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক একটি দেওয়ালিকা প্রকাশ করেন, যা সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

১৯৮৯ সালে ২০শে মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গঠনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরে তিনি পর পর দুই বার এই সংগঠনের সভাপতি

২য় পাতায় দেখুন

# খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী প্রচারণা তুঙ্গে

বিশেষ প্রতিবেদন॥ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ইউপিডিএফ-এর মনোনীত প্রার্থী প্রসিত বিকাশ খীসার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে। প্রতিদিন কোন না কোন এলাকায় সভা সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লিফলেট, বুকলেট ও নির্বাচনী ইস্তেহার বিলি করা হচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে ও বাড়ীঘরে সাঁটা হচ্ছে পোষ্টার ও স্টিকার। মাইকিংও চলছে জায়গায় জায়গায়। খাগড়াছড়ির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ইউপিডিএফ-এর অস্থায়ী নির্বাচনী কার্য্যালয় খোলা হয়েছে। এসব অফিসও এখন জমজমাট। প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ লোকজন অফিসে এসে খোঁজ খবর নিচ্ছেন ও ইউপিডিএফ-এর মনোনীত প্রার্থীর প্রতি তাদের সমর্থন জানাচ্ছেন। ইউপিডিএফ-এর বক্তব্য শোনার জন্য সাধারণ জনগণ এখন ব্যাকুল। সব এলাকায় পোষ্টার, স্টিকার, লিফলেট ও ইস্তেহারের চাহিদা রয়েছে ব্যাপক।

ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে এক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। হাজার হাজার পাহাড়ি বাঙালী এই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউপিডিএফ-এর আহ্বায়ক ও আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী প্রসিত বিকাশ খীসা এই সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।

গত কয়েকদিনে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব এলাকা থেকে এসব মিটিঙের রিপোর্ট এখনো আমাদের হাতে আসেনি। যেসব এলাকার রিপোর্ট পাওয়া গেছে তা নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

খাগড়াছড়ি: স্বনির্ভর মাঠে সবচেয়ে বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৫ সেপ্টেম্বর। পাঁচ হাজারের অধিক লোকজন উপস্থিত ছিলেন। ধ্রুব জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন সঞ্চয় চাকমা, কবিতা চাকমা, সাইদিঅং মারমা ও দেবদত্ত ত্রিপুরা। একইদিন দীঘিনালায়ও এক বিরাট নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। চার হাজার লোকজন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ১০ই সেপ্টেম্বর দাতকুপ্যার হেডম্যান পাড়ায় নির্বাচনী জনসভায় সেনা হামলার প্রতিবাদে চেঙ্গী স্কোয়ারে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি নেতা প্রমেশ্বর চাকমা, মিঠুন চাকমা ও স্বপন চাকমা বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, তার আগের দিন অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর ইটছড়ির ক্যাম্প কমান্ডার ঐ নির্বাচনী জনসভায় হামলা চালান। ১০ই সেপ্টেম্বর মাইসছড়িতে নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মুরুব্বী দুর্গা মোহন চাকমা, স্থানীয় যুবনেতা উত্তম চাকমা ও পিসিপি'র নেতৃবৃন্দ।

খাগড়াছড়ি সদরে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ৭ সেপ্টেম্বর পাইওনিয়ার ক্লাবে, ৮ সেপ্টেম্বর সকালে উত্তর খবংপুজ্যা আশ্রম স্কুলে ও বিকেলে দক্ষিণ খবংপুজ্যায়, ৯ সেপ্টেম্বর কলেজ গেট ও পশ্চিম নারাঙহিয়ার একাংশ নিয়ে, ১০ সেপ্টেম্বর কৃষি গবেষণা ও মিলনপুর বৌদ্ধ বিহারে, ১৩ সেপ্টেম্বর শিবালী বৌদ্ধ বিহারে, ১৪ সেপ্টেম্বর পানখাইয়া পাড়া, মধুপুর ও নোয়াপাড়ার লোকজনদের নিয়ে পানখাইয়া পাড়ায়, ১৭ সেপ্টেম্বর স্টেশন চত্তরে। এছাড়া ১৮ সেপ্টেম্বর তীরধনুক নিয়ে জেলা সদরে বিশাল নির্বাচনী মিছিল বের করা হয়। শিবমন্দির, পেরাছড়া, পৌরএলাকা, কমলছড়ি ও মাইসছড়ি থেকে কয়েক হাজার লোক এতে অংশগ্রহণ করেন।

পানছড়িতে ১৬ সেপ্টেম্বর ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী জনসভা আয়োজনের সময় সন্তু লারমার লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করতে আসে। বাজারে আসা সাধারণ লোকজন তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। পরে নির্বাচনী সমাবেশ প্রতিবাদ সমাবেশের রূপ নেয়। সঞ্চয় চাকমা ও কবিতা চাকমা বক্তব্য রাখেন। প্রতিবাদ সমাবেশের পর ৪টি খোলা জিপে করে খাগড়াছড়ি ফেরার পথে বড়ইতলী নামক স্থানে সন্তু লারমার সশস্ত্র সদস্যরা আবার হামলা চালায়। এতে বিসুক্যা চাকমা ওরফে শান্তি (২৩) পিতা কিষ্টলীলা চাকমা ঘটনাস্থলে মারা যায়। তার বাড়ি হচ্ছে শিবমন্দির এলাকার ৫নং যৌথ খামার। এছাড়া গুলিতে গুরুতর আহত হয় জ্যোতির্ময় ত্রিপুরা, সুনীল ত্রিপুরা, সোনা চাকমা ও রিপন চাকমা।

২য় পাতায় দেখুন

## সম্পাদকীয়

স্বাধিকার □ ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১ □ বুলেটিন নং ১৯

### সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন

সন্তু লারমা চক্র নির্বাচন প্রতিহত করার নামে যেভাবে একের পর এক ইউপিডিএফ-এর একনিষ্ঠ নেতা কর্মিদের খুন ও সাধারণ লোকজনের ওপর সন্ত্রাসী হামলা-ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন, তাকে কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। বার বার ঐক্য ও সমঝোতার প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও যারা এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ করতে পারে তাদেরকে জনগণের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকতে পারে না। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ায় সন্তু লারমা এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। তার এ ধরনের গণবিরোধী সন্ত্রাসী কাজে জনসংহতি সমিতির সাধারণ সদস্যদেরও কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। সরকারের কাছে বার বার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রশাসনের সদিচ্ছা নিয়ে আমরা সন্দিহান। সরকার যদি ইউপিডিএফ ও সাধারণ জনগণের জানমালের নিরপত্তা বিধান করতে না পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে জনগণ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্বস্তির জন্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সন্ত্রাসীদের কোন ক্ষমা নেই। যে কোন উপায়ে তাদেরকে প্রতিহত করে জনগণের বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলনের বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে জেএসএস-এর প্রকৃত সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিকদেরকেও নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে। আত্মঘাতি হানাহানিতে আমরা আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারি না।

## খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী প্রচারণা তুঙ্গে

১ম পাতার পর

রামগড়ে ১৪ সেপ্টেম্বর প্রচার মিছিল, ১৭ তারিখ খাগড়াছড়ি সদরের পশ্চিম নারাঙহিয়ায় ক্লাবের সদস্যদের সাথে মিটিঙ করা হয়। লক্ষ্মীছড়ির মরাচেঙে নামক এলাকায় ১৪ সেপ্টেম্বর স্থানীয় মুরুব্বী ও যুবকদের সাথে নির্বাচনী মিটিঙ অনুষ্ঠিত হয়। দুল্যাতলী, লক্ষ্মীছড়ি, হাজাছড়ি, মংলাপাড়া, শিলাছড়ি, তংতুল্যা, মেজরপাড়া, মগাপাড়া গ্রামের মুরুব্বী ও যুবকরা এতে অংশগ্রহণ করেন। তারা ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে খোলাখুলি মত বিনিময় করেন।

৩১ আগষ্ট লক্ষ্মীছড়ির হাজাছড়া গ্রামের মুরুব্বীদের সাথে মিটিং হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বৈদ্যপাড়ায় নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ললিত মেম্বার ও নির্মল চাকমা। ১৭ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীছড়ি সদরে বাঘ্যাপাড়া ও মরাচেঙে মুখ গ্রামে দুটি মিটিং হয়। এলাকার গণ্যমান্য মুরুব্বী, মেম্বার ও চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাঙ্গামাটি॥ নানিয়াচর, কুতুকছড়ি, বরকল, সুবলং, জুরাছড়ি, কাপ্তাই, কাউখালী, ঘাগড়া, বাঘাইছড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।

চুক্তির পর যে সব এলাকায় যাওয়া সম্ভব হয়নি, সেসব এলাকায়ও ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় এবং সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। কাপ্তাই উপজেলায় ফারুয়া হচ্ছে একটি দুর্গম এলাকা। সেখানে ইউপিডিএফ-এর কর্মিরা ১৮ সেপ্টেম্বর এগোজ্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহারে নির্বাচন বিষয়ে এলাকার সাথে মত বিনিময় করেন। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ইউপিডিএফ-এর বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। সেখানে ব্যাপক পোষ্টারিং হয়। এরপর দিন অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর বিলাইছড়ি থানার এগোজ্যা বাজারে ইউপিডিএফ-এর ঐ কর্মি যায়। সেখানে লোকজন অত্যন্ত আগ্রহভরে ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী মেনিফেষ্টো ও পোষ্টার চেয়ে নেয়। তারা জানান, এলাকায় সাধারণ মানুষ জেএসএস সন্ত্রাসীদের উৎপাতে ভীষণভাবে অতীষ্ঠ। তারা অভিযোগ করে বলেন, জেএসএস-এর পক্ষে যারা ঐ এলাকায় কাজ করছে তারা প্রায় সময়ই মদ, জুয়া ও হিরোইন-এ বুঁদ হয়ে থাকে। তাদের অভিমত জেএসএস-এর আর কোন ভবিষ্যত নেই। ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি বিলাইছড়ি বাজারে লোকজনের সাথেও মত বিনিময় করেন। সেখানেও পোষ্টার, লিফলেট ও পার্টির নির্বাচনী মেনিফেষ্টো বিলি করা হয়। চাইন্দ্যায় জেএসএস-এর সদস্যদের সাথেও ইউপিডিএফ-এর উক্ত প্রতিনিধির মত বিনিময় হয়। বহু জেএসএস সদস্য জানান, তারা ইউপিডিএফ-এর নীতি, আদর্শ ও কৌশলের সাথে একমত। জেএসএস-এর এই সদস্যরা ইউপিডিএফ প্রতিনিধিকে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে লুকিয়ে তাদের নৌকায় করে আলিকং পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয়। তারা অদূর ভবিষ্যতে ইউপিডিএফ-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।

এদিকে ৩০ আগষ্ট ঘাগড়ায় উল্লোপাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুলে নির্বাচনী সভা হয়। তালুকদার পাড়া ও রাঙী পাড়ার কয়েক শ' লোক এতে অংশগ্রহণ করেন। ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এলাকাবাসীর পক্ষে একজন প্রাক্তন শান্তিবাহিনীর সদস্য ও অপর একজন মুরুব্বী বক্তব্য রাখেন। তারা দু'জনেই কড়া ভাষায় জেএসএস-এর সমালোচনা করেন এবং বলেন, যারা নির্বিচারে কারণ ছাড়া নিজের ভাইদের খুন করতে পারে, যারা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, তাদেরকে কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। যারা আমাদের রক্ষা করে, যারা জনগণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছে, তাদেরকেই আমরা সমর্থন জানাবো ও ভোট দেবো।

১১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম শহরে লক্ষ্মীছড়ি এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান, হেডম্যান ও ঠিকাদার ব্যবসায়ীদের সাথে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। লক্ষ্মীছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রেম্ব্রাচাই মারমা, বর্মাছড়ি ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীলবর্ণ চাকমা, মেম্বার গুলমনি চাকমা, নীরন্ত চাকমা, বর্মাছড়ি মৌজার হেডম্যান ও মেম্বার চাথোয়াই মারমা, বেতবুনিয়া এলাকার প্রভাবশালী চেয়ারম্যান এস.এম চৌধুরীর সেক্রেটারী সুশীল, ফটিকছড়ি থেকে শান্তি রঞ্জন চাকমা, লক্ষ্মীছড়ি বাজারের বাজার চৌধুরী রসিক কুমার চাকমা, প্রাক্তন মেম্বার শান্তি কুমার চাকমা, বাবুল চৌধুরী, মনিন্দ্র চাকমা, কালেন্দ্র চাকমা ও বর্মাছড়ি স্কুলের শিক্ষক প্রাণবাঁশী চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## প্রসিত বিকাশ খীসার সংক্ষিপ্ত

১ম পাতার পর

নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের ১৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৪ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে বহাল ছিলেন। তার নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে ও এক ব্যাপক ছাত্র গণজোয়ার সৃষ্টি হয়।

এ সময় তিনি বেশ কয়েটি বলিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৯২ সালের এপ্রিলে লোগাং গণহত্যার পর সেখানে লংমার্চের কর্মসূচী গ্রহণ, একই বছর ২০শে মে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পিসিপি'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সরাসরি স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন, ১৯৯৩ সালে খাগড়াছড়িতে অন্যায়ভাবে জারিকৃত ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর প্রসিত খীসা ১৯৯৫ সালের ৩০ মে পাহাড়ি গণ পরিষদে যোগ দেন ও এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর নতুন পার্টি ইউপিডিএফ গঠনের আগ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে বহাল ছিলেন।

১৯৯৭ সালে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে তথাকথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তার নেতৃত্বে পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন তা প্রত্যাখ্যান করে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের ডাক দেয়। পরে তিন সংগঠন এক সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন পার্টি ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করে। এই নতুন পার্টি গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সম্মেলনে তাকে এই পার্টির আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়। আজ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে বহাল রয়েছেন এবং তার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ ইতিমধ্যে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে গণভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। - *স্বাধিকার সম্পাদক।*

# সন্তু লারমার নির্বাচন বয়কট কাকে লাভবান করবে?

সত্যদর্শী

জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন। যে দাবিতে তিনি এই ঘোষণা দেন তা হলো প্রধানত ভোটার তালিকা থেকে বহিরাগতদের বাদ দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে নতুনভাবে তালিকা প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। এ ছাড়া অন্যান্য দাবিও রয়েছে। তাদের এই দাবির সাথে ইউপিডিএফ-এর কোন বিরোধ নেই। বরং ইউপিডিএফ-ও বহু আগে থেকেই এ ধরনের দাবি জানিয়ে আসছে। সে জন্য ইউপিডিএফ জেএসএস-এর কাছে বার বার ঐক্যের প্রস্তাব দেয়, যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করা যায়। কিন্তু জেএসএস বরাবরই ইউপিডিএফ-এর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় আন্দোলনে যেতে তারা রাজী হয়নি। অথচ সে সময় যদি ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করা যেতো তাহলে আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের দাবি মানতে বাধ্য হতো। সঠিক সময় সঠিক কাজ করতে হয়। অসময়ে করলে তা কোন ফল দেয় না। যে আন্দোলন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় করা উচিত ছিল, তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে করলে কি কোন ফল দেবে?

কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করা যে কোন রাজনৈতিক দলের একটি কৌশলগত বিষয়। ইউপিডিএফ-ও তার দলগত অবস্থা, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশীয় পরিস্থিতির সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের পর কৌশলগত কারণে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এ সিদ্ধান্ত যে সঠিক তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এক কথায়, ইউপিডিএফ মনে করে নির্বাচন বয়কট করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।

এখন জেএসএস-এর অবস্থাটা কি তা দেখা যাক। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবি জানালেও, জেএসএস-কে নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার কর্মসূচীর দিকে যেতে হয়েছে ভিন্ন কারণে। নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবি পূরণ না হওয়া এ ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। আসল কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগের সাথে আসন্ন নির্বাচনে আসন বণ্টন নিয়ে সমঝোতা না হওয়া। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, জেএসএস আওয়ামী লীগের কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনের মধ্যে অন্তত রাঙ্গামাটির আসনটি দাবি করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আওয়ামী লীগ নেতারা চান, জাতীয় নির্বাচনে জেএসএস আওয়ামী লীগকে পূর্বের মতো সক্রিয় সমর্থন দিক, প্রতিদান হিসেবে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা পরিষদ নির্বাচনে জেএসএস-কে সমর্থন দেবে। কিন্তু জেএসএস নেতৃবৃন্দ এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আসন বণ্টন নিয়ে তাদের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ার খবর পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনী সমঝোতা হতো তাহলে জেএসএস নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার কর্মসুচীর দিকে আদৌ পা বাড়াতো না। তাছাড়া, নির্বাচন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত দলের অভ্যন্তরে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে নেয়া হয়নি। "দাবি অনুযায়ী নতুন ভোটার তালিকা প্রণীত না হলে কি করবেন" সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাবে সন্তু লারমা নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলেছিলেন। এজন্য জেএসএস-এর অভ্যন্তরে উচ্চ ও মাঝারী পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ রয়েছে বলে জানা যায়। আসল কথা হলো, আওয়ামী লীগের সাথে বোঝাপড়া হলে জেএসএস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো। কারণ আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন বড় রাজনৈতিক দলের কাঁধে ভর না দিয়ে জেএসএস-এর পক্ষে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয়। এ হচ্ছে মেরুদন্ডহীন রাজনীতি, যা জনগণের জন্য কোন মঙ্গল করতে পারে না। এ সত্য কথাটি বিগত দু'টি নির্বাচনে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু যে কারণে জেএসএস নির্বাচন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নিক, তা বর্তমান সময়ে জুম্ম জনগণের জন্য অপকার বৈ উপকার করবে না। তাদের নির্বাচন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটি আত্মঘাতি কর্মসূচী। তাদের এই কর্মসূচী মুখ্যত বিএনপিসহ চারদলীয় জোটকেই লাভবান করবে। কারণ, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের ভোটার সংখ্যা হচ্ছে ৪৮ শতাংশ। এখন জেএসএস যদি নির্বাচন প্রতিহত করে তাহলে এই বাঙালী ভোটারদের ওপর তারা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। তাদেরকে জেএসএস বুঝিয়ে কিংবা জোর জবরদস্তি কোনভাবেই ভোট কেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না। ধারণা করা হয় এই বাঙালী ভোটাররা মূলত বিএনপি'র ভোট ব্যাংক। অপরদিকে, জেএসএস যে সব এলাকায় ভোট কেন্দ্রে যেতে লোকজনকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে সে সব এলাকাগুলো হচ্ছে পাহাড়ি অধ্যুষিত এলাকা। এখন যদি এসব এলাকার পাহাড়িরা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে না পারেন তাহলে ক্ষতি হবে পাহাড়িদের নিজস্ব প্রার্থীদেরই, বা যথার্থভাবে বলতে গেলে, ইউপিডিএফ মনোনীত বা সমর্থিত প্রার্থীদের। আর এতে বিশেষভাবে লাভবান হবে বিএনপি প্রার্থীরা। ক্ষেত্র বিশেষে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরাও। কাজেই জেএসএস-এর নির্বাচন প্রতিহত করার কর্মসূচী শেষ পর্যন্ত ইউপিডিএফ-কে ঠেকানোর কর্মসূচীতে পর্যবসিত হয় কিনা সে ব্যাপারে সাধারণ জনগণ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জনগণের এই উদ্বেগ বেড়ে যায়, যখন জেএসএস প্রধান সন্তু লারমা বিএনপি সেক্রেটারী জেনারেল মান্নান ভুঁইয়া ও স্বৈরাচারী এরশাদের সাথে একান্তে সাক্ষাত করেন। এই উদ্বেগ বেড়ে যায়, যখন কানাঘুষা শোনা যায় যে জেএসএস নির্বাচন প্রতিহত করার কথা ঘোষণা করলেও গোপনে তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীকে সমর্থন দিচ্ছে। যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে তা হবে জেএসএস-এর চরম নীতিহীনতা ও নিজের নাক কেটে হলেও ইউপিডিএফ-কে ঠেকানোর চক্রান্ত।

**জেএসএস এর প্রতি আমাদের সবিনয় অনুরোধ, আপনারা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে আপনাদের নির্বাচন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করুন। এমনভাবে আপনাদের নির্বাচনী কৌশল ঠিক করুন যাতে কেউ সে কৌশলকে অতি বিপ্লবীপনা কিংবা সুবিধাবাদীতা আখ্যা দিতে না পারে। জাতির ক্রান্তিলগ্নে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ নয়, জনগণের পক্ষের প্রার্থী অর্থাৎ ইউপিডিএফ এর মনোনীত ও সমর্থিত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে সময়োপযোগী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা নিন। জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার ভবিষ্যৎ আন্দোলনে নতুন নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা দিন।**

জেএসএস এর প্রতি আমাদের সবিনয় অনুরোধ, আপনারা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে আপনাদের নির্বাচন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করুন। এমনভাবে আপনাদের নির্বাচনী কৌশল ঠিক করুন যাতে কেউ সে কৌশলকে অতি বিপ্লবীপনা কিংবা সুবিধাবাদীতা আখ্যা দিতে না পারে। জাতির ক্রান্তিলগ্নে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ নয়, জনগণের পক্ষের প্রার্থী অর্থাৎ ইউপিডিএফ এর মনোনীত ও সমর্থিত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে সময়োপযোগী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা নিন। জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার ভবিষ্যৎ আন্দোলনে নতুন নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করুন। □

# আওয়ামী লীগের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম

**সবাইকে একজোট হয়ে নিজেদের পক্ষের প্রার্থীকে অর্থাৎ ইউপিডিএফ সমর্থিত প্রার্থীদেরকে জয়যুক্ত করতে হবে। নিজেদের শক্তিকে আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলের কাছে তুলে দেয়া হবে মারাত্মক আত্মঘাতি ভুল। বরং অতীতের মতো আওয়ামী লীগকে জনগণের সাথে প্রতারণা করার শাস্তি কড়ায় গন্ডায় দিতে হবে এবারের নির্বাচনে।**

বৃটিশদের আগমণের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল স্বাধীন। পরাক্রমশালী মোগলরাও পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিকার করতে পারেনি। তাদের সাথে পার্বত্য চট্টগামের রাজার এক ধরনের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদানের বিনিময়ে মোগলদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম সীমান্ত বরাবর হাট বাজারসমূহ ব্যবহারের অধিকার লাভ করেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লাহর পরাজয়ের পর বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে পুরো ভারতের শাসন ক্ষমতা অধিকার করে নেয়। কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ক্ষমতা সংহত করার পর বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্যসমূহে থাবা বিস্তার করতে শুরু করে। কিন্তু বৃটিশ শক্তি সহজে ও বিনা বাধায় এ রাজ্যসমূহ দখল করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামেও বৃটিশরা আগ্রাসন চালালে রাজার সাথে তাদের যুদ্ধ বেঁধে যায়। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত তিন পর্বে যুদ্ধ চলে। চাকমা রাজার প্রধান সেনাপতি রনু খাঁ এই যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন এবং গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল প্রয়োগ করে বৃটিশ সৈন্যদেরকে পরাস্ত করেন। কোনভাবেই যখন রনু খাঁর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামকে দমন করতে সক্ষম হয়ে উঠছিল না, তখন বৃটিশ শক্তি সন্ধির প্রস্তাব দিলে রাজা জান বক্স খাঁ তা মেনে নেন। অবশেষে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ১৭৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জান বক্স খাঁ ও গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে জান বক্স খাঁকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি, তার কর সংগ্রহের অধিকারের স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতিসহ আরো অনেক বিষয় লিখিত ছিল। কিন্তু ক্রমে ধূর্ত বৃটিশ বেনিয়ারা এই চুক্তির বরখেলাপ করতে থাকে এবং জোর জবরদস্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের শাসনামলে এবং পরে বর্তমান বাংলাদেশের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতাই বজায় থাকে। প্রত্যেক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ভুলুণ্ঠিত করে, ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন শোষণ জারি রাখে এবং সেখানকার মূল্যবান সম্পদ লুণ্ঠন করে নেয়।

মাত্র ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের পর বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে ইচ্ছে ও আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। এর পেছনে ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সুগভীর ষড়যন্ত্র। বস্তুত: আওয়ামী লীগ হচ্ছে ঠিকাদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সুদখোর ও মধ্যস্বত্বভোগীদের একটি দল। সেকারণে এ দলের নেতৃত্ব ছিল স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ও কুপমুন্ডুক। এই সংকীর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই আওয়ামী লীগ সে সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে বৃহত্তর যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারেনি। এমনকি মুক্তিবাহিনী ও তথাকথিত মুজিব বাহিনীর সদস্যরা প্রায় ক্ষেত্রে পাকিস্তানী হানাদারদের ওপর আঘাত হানার বদলে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত অন্যান্য দলের সদস্যদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে থাকে। তাদের ভাবখানা যেন এমন আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউ এই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং বিজয়ের সাফল্যে ভাগ বসাতে পারবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগ নিজে কেমন মুক্তিযুদ্ধ করেছে? বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূমিকাও নতুনভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও আরো হবে।

তবে যাই হোক, ভারতের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ নবগঠিত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ একদিকে সারা দেশে লুটপাট চালাতে থাকে, আবার অপরদিকে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের নামে দেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর ওপর বাঙালী জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়। এটা আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে যে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭২ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিতে গেলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান তাকে ও তার সাথে থাকা অন্য প্রতিনিধিদেরকে চরমভাবে অপমানিত করেন। তিনি তার নিকট পেশ করা স্মারকলিপি ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং লারমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের জাতিগত পরিচয় ভুলে যাও এবং বাঙালি হয়ে যাও। শুধু তাই নয়, তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, লারমা তুমি বেশী বাড়াবাড়ি করো না। প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক...দুই....দশ....বিশ লাখ বাঙালি ঢুকিয়ে দিয়ে তোমাদের জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলে দেয়া হবে। এই হুমকি তিনি রাঙামাটি গিয়েও দিয়েছিলেন। রাঙামাটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সমাবেশে তিনি বলেন, আজ থেকে তোমাদেরকে বাঙালিতে উন্নীত করা হলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের এই বক্তব্য ও হুমকি সহজভাবে নিতে পারেনি। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বিশেষত তখনকার জুম্ম মধ্যবিত্তশ্রেণী ও প্রতিবাদী ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের করাল থাবা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা সোচ্চার হয়ে উঠেন। জুম্ম জনগণ শেখ সাহেবের ঐ দম্ভোক্তি ও পাহাড়ি নেতাদের অপমানের প্রতিশোধ নেন ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে। এই নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের আসনসমূহে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি ঘটে। জনগণ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করে রায় দেন। এরপর ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও জুম্ম জনগণ আওয়ামী লীগ প্রার্থীদেরকে পরাজিত করেন। সত্যিকার অর্থে, যে দল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, যে দল জোর জুলুম ও দমন পীড়ন চালিয়েছে, জুম্ম জনগণ বরাবরই সেই দলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে কারণে ১৯৯১ সালের আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কোন প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত হতে পারেনি, যদিও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের ভাবমূর্তি থাকার জন্য সারা দেশে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ছিল তখন তুঙ্গে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের শাসনামল দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব হচ্ছে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট। আর দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। প্রথম পর্বের আলোচনা উপরে শুরু করা হয়েছে। এই পর্বে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি ঠিক করে নেয়। পরবর্তীতে সামরিক বেসামরিক সরকারসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে যা করেছে তা কেবল এই নীতিরই ধারাবাহিকতা বা তার বাস্তবায়ন। জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু পাকিস্তানের মতো নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রেও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভুলুণ্ঠিত করা হয়। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের ৬ নং ধারায় লেখেন, বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন। শেখ সাহেবের ঐ বাঙালি হয়ে যাওয়ার নির্দেশ কেবল কথার কথা ছিল না। তিনি পাহাড়িদেরকে জোরপূর্বক বাঙালি জাতীয়তাবাদে একীভূত করার জন্য আয়োজন শুরু করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন ক্যান্টনমেন্ট নির্মাণ, আর বাঙালিদের অবাধে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এক কথায়, স্বাধীন বাংলাদেশে পাহাড়িদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ শেখ সাহেবের এই নীতি মেনে নেয়নি। তারা নিজেদের স্বকীয় জাতীয় সত্তা রক্ষা করতে সংগঠিত হতে থাকেন। প্রধানত তরুণ প্রতিবাদী ছাত্র সমাজ এক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে সপরিবারে নিহত হলে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়। এর পরবর্তীতে সামরিক সরকার দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তাদের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা বর্ণনা করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। যেমনটা এই লেখার শিরোনাম দেখেই বোঝা যায়, "আদিবাসী-দরদী" সেজে থাকা আওয়ামী লীগের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের অধিকার কিভাবে পদদলিত হয়েছে তার ওপর আলোকপাত করাই এ লেখার উদ্দেশ্য।

আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় শাসনামল শুরু হয় ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভের পর। এ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়লাভ করে। এর আগে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সব আসনে আওয়ামী লীগ জয়যুক্ত হয়েছিল। এই দুটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পিছনে কারণ হচ্ছে জনসংহতি সমিতির ভুল সিদ্ধান্ত। তারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে বিনা শর্তে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সমর্থন জানায়। ফলে জনসংহতি সমিতির কথায় জুম্ম জনগণ তাদের ভোট এমন একটি দলের নিকট তুলে দিতে বাধ্য হয় যে দল তাদের জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলে দিতে তৎপর। জনসংহতি সমিতির এ এক চরম অপরিণামদর্শীতা। কেন আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে হবে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে কি কি লাভ হবে বা কি ক্ষতি হবে এসব তারা কখনো ভেবে দেখেছে বলে মনে হয়নি। আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা যে কত আত্মঘাতি ও ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তা জেএসএস এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। অথচ তাদের তত্ত্ব ছিল বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাতের চাইতে আওয়ামী লীগ হচ্ছে জুম্ম জনগণের জন্য গ্রহণযোগ্য দল। কিন্তু কেন, তা তারা কখনো বলতে পারেনি। তাদের এই গ্রহণযোগ্যতার তত্ত্বও যে চরম আত্মঘাতি তা কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন যে কারোর বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যে দল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে পাহাড়ি জনগণকে বিলীন করতে চায়, যে দল স্বাধীনতার পর গৃহীত বাংলাদেশ সংবিধানে জুম্ম জনগণের জাতিগত স্বীকৃত দেয়নি এবং যে দল জুম্ম জনগণের ওপর নিপীড়ন নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানোর ভিত্তি তৈরি করে, সে দল কিভাবে পাহাড়ি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তার ব্যাখ্যা জেএসএস কোনদিন দিতে পারেনি। তাদের ঐ তত্ত্ব যে ব্যক্তি স্বার্থ চিন্তা থেকে উদ্ভূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এটা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না যে, বিগত দুটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়যুক্ত হলেও জুম্ম জনগণের কোন লাভ হয়নি। বিগত ১০ বছরে আওয়ামী লীগ সংসদে বিরোধী দল ও সরকারী দল হিসেবে ছিল। কিন্তু কোন সময়ই তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে সংসদে আলোচনার উদ্যোগ নেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে লোগাং ও নানিয়াচর গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পরও তারা সংসদে এ ব্যাপারে একটি কথাও বলেনি। তাহলে কেন জনগণ তাদেরকে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠালো? অন্তত জনগণের কথা বলার জন্য যদি সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত তিন আওয়ামী লীগ এমপি চরমভাবে ব্যর্থ। শুধু ব্যর্থ বললে ভুল হবে; অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল চরম লজ্জাজনক। যেমন জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে দেন। আসলে কোন ব্যক্তির পক্ষে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সংবিধান মোতাবেক কোন সংসদ সদস্য ফ্লোর ক্রসিং করলে বা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে সংসদে ভোট দিলে তার সংসদ সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। অথচ যদি জুম্ম জনগণের পক্ষে সংসদে একজনও স্বতন্ত্র এমপি থাকতো তাহলে এ রকম হতো না। ভবিষ্যতে এ রকম ভুল যেন না হয় তার জন্য আমাদের সকলকে শিক্ষা নিতে হবে। না হলে আবার একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। জুম্ম জনগণকে একই বৃত্তে ঘুরপাক খেয়ে থাকতে হবে।

বিগত ৫ বছরের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কি পেয়েছে? আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে তার প্রতিদান হিসেবে তারা কি পেয়েছে? আওয়ামী লীগ হরহামেশা বলে থাকে যে জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি করে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করেছে। এটাকে তারা তাদের এক বিরাট সাফল্য হিসেবে প্রচার করে। তথাকথিত শান্তিচুক্তি যে আওয়ামী লীগের এক বড় সাফল্য সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে কি দিয়েছে? প্রথমত যে চুক্তি হয়েছে তা হচ্ছে ভাওতাবাজি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেমন ভূমি সমস্যা, বহিরাগতদের ভবিষ্যত, সেনাবাহিনী ইত্যাদি ব্যাপারে চুক্তিতে হয় মোটেই উল্লেখ করা হয়নি অথবা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। মূল সমস্যাগুলো সমাধান করা না হলে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তা বোধশক্তিসম্পন্ন যে কেউ বুঝতে পারেন। এক কথায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে একটি গলদপূর্ণ ভাওতাবাজি চুক্তি উপহার পেয়েছেন। সন্তু লারমার ভাষায় আওয়ামী লীগের সাথে চুক্তি করে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তাহলে দোষ দেবেন কাকে? প্রতারিত হওয়ার জন্য দোষ কি কেবল আওয়ামী লীগের? এর জন্য কি সন্তু লারমারাও দায়ি নন? দ্বিতীয়ত, এই চুক্তিও আওয়ামী লীগ সরকার তার শাসনকালে বাস্তবায়ন করেনি। না করার জন্য জনসংহতি সমিতিও কিছুই করতে পারেনি। কারণ চুক্তিটি ছিল অসম্পূর্ণ। চুক্তির ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু দায় দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। সাধারণত পক্ষসমূহ একই সময়ে সমান্তরালভাবে এই দায় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু জেএসএস - আওয়ামী লীগ সরকারের চুক্তির ক্ষেত্রে তা হয়নি। চুক্তির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের জন্যও যে দায় দায়িত্ব সৃষ্টি হয়েছে তার কোন একটি পালনের আগেই জেএসএস তার সব কয়টি দায় দায়িত্ব পালন শেষ করে। ফলে চুক্তি বাস্তবায়ন আওয়ামী লীগের ইচ্ছা ও মর্জির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, এবং আওয়ামী লীগ চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করতে থাকে। চুক্তির অনেক দুর্বলতার মধ্যে এটিও একটি বড় দুর্বলতা। আওয়ামী লীগের ওপর জনসংহতি সমিতির মাত্রারিক্ত আস্থা ও অন্ধ বিশ্বাসের ফলেই সন্তু লারমাদেরকে প্রতারিত হতে হয়েছে। রাজনৈতিক হাট বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ হলে এ রকম হতে হবেই। তৃতীয়ত, জনগণের মৌলিক দাবিগুলো পূরণ না হওয়ায় চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসেনি। বরং এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অশান্তি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যই উপহার দিয়েছে। আওয়ামী লীগ চুক্তির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতিকে কব্জা করে আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে সাময়িকভাবে হলেও দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি ও অনৈক্য সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এক কথায় আওয়ামী লীগের বিগত পাঁচ বছরের শাসনামল ছিল চরম অশান্তি ও অরাজকতায় ভরা।

কাজেই সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে এটাই বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। নিজেদের শক্তির ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। নিজেদের মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতি ফিরিয়ে আনতে হবে। এবারের নির্বাচনে এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সবাইকে একজোট হয়ে নিজেদের পক্ষের প্রার্থীকে অর্থাৎ ইউপিডিএফ সমর্থিত প্রার্থীদেরকে জয়যুক্ত করতে হবে। নিজেদের শক্তিকে আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলের কাছে তুলে দেয়া হবে মারাত্মক আত্মঘাতি ভুল। বরং অতীতের মতো আওয়ামী লীগকে জনগণের সাথে প্রতারণা করার শাস্তি কড়ায় গন্ডায় দিতে হবে এবারের নির্বাচনে। জুম্ম জনগণের নিজেদের প্রার্থীরা যদি জয়যুক্ত হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন বেগবান হবে। রাজপথ ও সংসদ উভয় ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব হবে। জনগণের সুখ দুঃখের কথা, দাবি দাওয়া ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলার জন্য দরকার জনগণের পক্ষের একটি দল। ইউপিডিএফ হচ্ছে সেই রকম একটি পার্টি যার দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যে পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য বিড়ম্বিত নির্যাতিত মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমান সময়ে একমাত্র ইউপিডিএফ-ই বিশ্বস্ততার সাথে সংসদে জুম্ম জনগণের কথা তুলে ধরতে পারে। ❐

# বিএনপি'র শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি গঠন করেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৬ সালে দেশে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন। একদিকে ভাসানী ন্যাপ ও অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী দলগুলোতে ভাঙণ ধরিয়ে দিয়ে সেই দলগুলো থেকে বেরিয়ে আসা লোকজন দিয়ে তিনি তার এই দল গঠন করেন।

বর্তমান লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিএনপি'র নীতি বিশ্লেষণ ও তাদের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরা। বিএনপি দুই বার দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম বারের মেয়াদ হচ্ছে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত। দ্বিতীয় বার হচ্ছে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত।

**১ম পর্ব**

জেনারেল জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ না নিয়ে তাকে অর্থনৈতিক ও আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের জন্য যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেগুলো হলো:

১. উন্নয়ন বোর্ড গঠন: ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়া এই বোর্ড গঠন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের মতে, তথাকথিত বিদ্রোহ দমনের কৌশল হিসেবে এটি গঠন করা হয়েছিল। পাহাড়ি জনগণের মধ্যে একটি অংশকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করেছে এটি গঠনের পেছনে।

২. সেটলারদের অনুপ্রবেশ: পাহাড়ি জনগণকে নিজ জন্মভূমিতে সংখ্যালঘু করে তাদের জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলে দেয়ার লক্ষ্যে কয়েক লক্ষ বাঙালিকে জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন।

৩. ট্রাইবেল কনভেনশন গঠন: পাহাড়ি জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের জন্য তিনি এই কনভেনশন গঠন করেন।

৪. সামরিকায়ন: তার আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ন ঘটে। সামরিকভাবে জনগণের আন্দোলন দমনের জন্য শুরু হয় অবর্ণনীয় অত্যাচার নির্যাতন, সেনা হামলা।

৫. কনসেনট্রেশন ক্যাম্প গঠন: ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর আদলে সেনাবাহিনী যৌথ খামার, আদর্শগ্রাম সৃষ্টির কর্মসূচী শুরু করে। এখানে উন্নয়নের নামে পাহাড়িদেরকে ধরে ধরে নিয়ে এসে বন্দী করা হয়।

জিয়ার আমলে ১৯৮০ সালে কাউখালির কলমপতিতে প্রথম গণহত্যা হয়। ২০০ জন নিরীহ পাহাড়িকে সেনাবাহিনী ও সেটলাররা মিলে জবাই করে হত্যা করে। সেটলারদের আগমণের ফলে জমি বেদখল শুরু হয় ব্যাপক হারে। রামগড়, ফেনী সহ বিভিন্ন এলাকা তাদের বেদখলে চলে যায়। হাজার হাজার পাহাড়ি জায়গা জমি থেকে উৎখাত হয়। সেনা অপারেশন চালানো হয় সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে। সাধারণ জনগণের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়, লোকজনকে বিনা কারণে ধরে ধরে মেরে ফেলা হয়, শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। মা বোনকে ধর্ষণ করা হয়। এক কথায় জিয়ার শাসনামলে সেনাবাহিনী পাহাড়ি জনগণের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়।

জেনারেল জিয়া ১৯৮১ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাতে প্রাণ হারান। পরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন স্বৈরাচারী শাসক জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। ১৯৯০ সালের এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে পতনের আগ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। তার আমলে পার্বত্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছে। একের পর এক গণহত্যা সংঘটিত হয়। হাজার হাজার পাহাড়ি নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। চাপিয়ে দেয়া হয় তথাকথিত জেলা পরিষদ।

তবে, নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে ওঠে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সমগ্র জনগণ এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশগ্রহণ করেন।

**২য় পর্ব**

এরশাদের পতনের পর একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি এই নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। একটি নির্বাচিত সরকার হিসেবে খালেদা জিয়ার সরকার রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উদ্যোগ নেবেন সেটাই ছিল জনগণের প্রত্যাশা। কিন্তু তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই ঘোষণা দেন যে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পূর্বতন সরকার অর্থাৎ এরশাদ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। পূর্বের নীতির বদল করবেন না। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর নির্দয় দমন পীড়ন চলতে থাকে। মানবাধিকার লঙ্ঘন নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল লোগাং-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে জঘন্যতম ও ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়। এতে লোগাং গুচ্ছগ্রামে সেটলার ও নিরাপত্তা বাহিনীর হামলায় ১২০০ জন পাহাড়ি প্রাণ হারান। এরপর ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর নানিয়াচরে আরো একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়। এখানে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বহিরাগতরা ৩৬ জন পাহাড়িকে হত্যা করে। এছাড়া পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে দমনের জন্য বিভিন্ন স্থানে সরকার ও সেনাবাহিনী সেটলারদের দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। রাঙ্গামাটিতে ১৯৯২ সালের ২০শে মে দুই শতাধিক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। দীঘিনালায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ ভরদাসমুনিকে হত্যা করা হয়। খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী বখাটে মাস্তানদের দিয়ে মুখোশ বাহিনী গঠন করে। এদের উৎপাতে জনজীবন তখন বিষিয়ে উঠেছিল। এদেরকে প্রতিহত করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় অমর বিকাশ চাকমা। এছাড়া পানখাইয়া পাড়ায় আরো শহীদ হয় ক্যজয় মারমা। খালেদা জিয়ার আমলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ি গণ পরিষদের অসংখ্য নেতা কর্মিকে জেলে আটকে রাখা হয়। রাজনৈতিক নিপীড়নের অংশ হিসেবে তাদেরকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। পাহাড়ি গণ পরিষদের তৎকালীন নেতা মনোতোষ দেওয়ান ও বিজয় কেতন চাকমাকে দীর্ঘদিন করাগারে অন্তরীণ রাখা হয়। এক কথায়, বিএনপি'র আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এক বিন্দুও শান্তিতে থাকতে পারেনি।

এবারে নির্বাচনী ইস্তেহারে বিএনপি সাংবিধানিক সমাধানের কথা বলেছে। কিন্তু সেটা কি ধরনের সাংবিধানিক সমাধান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্বের নীতি বলবৎ করবে কিনা, লোগাং ও নানিয়াচর গণহত্যার মতো ঘটনা আর ঘটবে না, কল্পনা চাকমার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবে কিনা এই মর্মে নিশ্চয়তা বিএনপি দেয় কিনা সে ব্যাপারে তাদের নির্বাচনী ইস্তোহার একেবারে নিশ্চুপ। গত দুটি নির্বাচনী ইস্তেহারে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কি ধরনের রাজনৈতিক সমাধান তা তারা তখন কেউ সুস্পষ্টভাবে বলেনি। এবারেও একই ধরনের অস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে ঠকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য ও প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলকে ভোট দেবেন না।

রাঙ্গামাটিতে এবারে বিএনপি, জামাত-শিবির ও ইসলামী ঐক্য জোটের সমন্বিত প্রার্থী হয়েছেন মনি স্বপন দেওয়ান। তিনি মনোনয়ন পাওয়ার কয়েকদিন আগেই বিএনপিতে যোগ দান করেছিলেন। রাজনীতিতে এ ধরনের কাজকে বলে সুবিধাবাদ ও নীতিহীনতা। পাহাড়িদের মধ্যে যার ন্যুনতম দেশপ্রেম ও আত্মমর্যাদাবোধ আছে সে কখনোই বিএনপিতে যোগ দিতে পারে না ও স্বাধীনতা বিরোধী ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠির মনোনীত প্রার্থী হতে পারে না। এখন সময় এসেছে এসব ভণ্ড দেশ দরদী, সুবিধাবাদী-প্রতিক্রিয়াশীদের চিনে রাখা ও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে প্রকৃত দেশপ্রেমিক শক্তির পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন শক্তিশালী নেতৃত্ব গঠনে ভূমিকা রাখা।

## বিভিন্ন স্থানে পিসিপি'র নতুন কমিটি গঠিত

১৫ আগষ্ট পিসিপি পেরাছড়া আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। জ্যোতিষ বিকাশ চাকমা আহ্বায়ক ও প্রসিস চাকমা সদস্য সচিব নির্বাচিত হন। ২২শে আগষ্ট কৃষি গবেষণা এলাকায় কেসি মারমার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা আসন্ন নির্বাচনে ইউপিডিএফ-কে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। এরপর ঐ সভায় পিসিপি'র আহ্বায়ক কমিটিও গঠন করা হয়। ২৪ আগষ্ট ভাইবোনছড়ায় ঝন্টু চাকমার সভাপতিত্বে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও পিসিপি'র কমিটি গঠন করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা শাখা গঠন করা হয়। ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন যথাক্রমে স্বপন কুমার চাকমা, পুলক জ্যোতি চাকমা ও নিকু চাকমা। ১৯ সেপ্টেম্বর রামগড়ে পিসিপি'র আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আহ্বায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব হলেন যথাক্রমে মংক্যচিং মারমা, আপ্রুচি মারমা ও শ্যামল ত্রিপুরা।

## সন্তু সন্ত্রাসীদের হামলায় প্রাক্তন পিসিপি সভাপতি রূপক চাকমা নিহত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ায় সন্তু লারমা চক্র এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। সন্ত্রাসের ওপর ভর করে নিজের অস্তিত্ব ঠিকিয়ে রাখার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। নির্বাচন প্রতিহত করার নামে সাধারণ জনগণ ও ইউপিডিএফ-এর ওপর নির্বিচারে সন্ত্রাসী হামালা চালাচ্ছে। তাদের সশস্ত্র হামলার সর্বশেষ শিকার হয়েছেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও ইউপিডিএফ-এর একনিষ্ঠ কর্মি রূপক চাকমা।

গত ২১ সেপ্টেম্বর ইউপিডিএফ প্রার্থী প্রসিত বিকাশ খীসার পক্ষে প্রচারণা চালানোর সময় পুজগাঙের মধুমঙ্গল হেডম্যান পাড়ায় হামলা চালিয়ে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করে ও মোহন চাকমা ও সুজিত চাকমা নামে অপর দু'জনকে গুরুতর আহত করে। এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ঢাকায় অনেকে রূপক চাকমার নিহত হওয়ার খবর শুনে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত পাহাড়িরা ফোনে ঢাকায় ইউপিডিএফ-এর দপ্তরে খোঁজ খবর নেন ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করার অনুরোধ জানান।

২২শে সেপ্টেম্বর রূপক চাকমা হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ রূপক চাকমা হত্যার জন্য জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপকে দায়ি করেন এবং হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসীদেরকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত করতে হবে।

ঢাকায় আগামীকাল পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, আজ ২২ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে রূপক চাকমার অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। হাজার হাজার লোক এতে অংশগ্রহণ করেন। এর আগে তার শবদেহ তার বাড়ি পূর্ব নারাঙহিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইউপিডিএফ ও তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমে তার রক্ত ঋণ শোধ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

# খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-এর বিশাল র‍্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ১লা অক্টোবর খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-এর বিশাল র‍্যালী ও গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফ এর ওপর অব্যাহত দমন পীড়নের প্রতিবাদ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির দাবিতে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশ ও র‍্যালীতে দেড় হাজার নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ইউপিডিএফ-এর ওপর দমন পীড়নের তীব্র সমালোচনা করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে জনগণের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে তার যথার্থ জবাব দেয়ার আহ্বান জানান।

প্রবল ঝড় বৃষ্টি সত্ত্বেও ইউপিডিএফ-এর এই সমাবেশ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের আগ্রহের কমতি ছিল না। খাগড়াছড়ির পানছড়ি, দীঘিনালা, মাইসছড়ি, মাটিরাঙ্গা, মহালছড়িসহ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সাধারণ লোকজন এই কর্মসূচীতে অংশ নেন। প্রথমে বিকেল ৩টায় স্বনির্ভর বাজার থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি খবংপুজ্যা, চেঙ্গী স্কোয়ার, মহাজন পাড়া ও শাপলা চত্বর ঘুরে এসে খেজুর বাগান হয়ে আবার স্বনির্ভর বাজারে এসে শেষ হয়। এরপর ইউপিডিএফ নেতা অনিল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল সমাবেশ। বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ধ্রুবজ্যোতি চাকমা ও সঞ্চয় চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রমেশ্বর চাকমা ও অর্থ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং নানাভাবে সাধারণ জনগণের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। ইউপিডিএফ-এর ওপরও চলছে রাজনৈতিক দমন পীড়ন। নেতৃবৃন্দ আসন্ন নির্বাচনে এর দাঁত ভাঙা জবাব দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, ইউপিডিএফ ও সাধারণ জনগণের ওপর দমন পীড়ন চালিয়ে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়া যাবে না। জনগণ যেভাবে লোগাং গণহত্যার পর বাঁধভাঙা পানির মতো প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন, ভবিষ্যতেও তারা আবার অমিত তেজে জ্বলে উঠবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এখন না পাওয়ার বঞ্চনায় ফুঁসে উঠছেন। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলে যে কোন মুহূর্তে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে ওঠে তাদের অধিকারের কড়ায় গন্ডায় হিসাব চাইবেন।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ সরকার ও তার দোসরদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, জনগণকে গোবেচারা মূর্খ ভাববেন না। ভাববেন না তারা জানেন না কারা চুক্তির ফলে লাভবান হয়েছে ও হচ্ছে, কারা সাধারণ জনগণের মাথায় কাঠাল ভেঙে খাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ আসন্ন নির্বাচনে জনগণের পক্ষের শক্তিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, জেএসএস ও সরকারের মধ্যে তথাকথিত শান্তিচুক্তির পর রাজনৈতিক নিপীড়নের অংশ হিসেবে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের বহু সমাবেশ বানচাল করে দেয়া হয়। ১৯৯৮ সালের ২২শে এপ্রিল পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর যৌথ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে আসা জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালালে সুরমনি ও প্রতুল প্রাণ হারায়। এরপর ২২শে অক্টোবর ১৯৯৯ খাগড়াছড়িতে বাবুছড়া ঘটনার প্রতিবাদে আহুত ইউপিডিএফ-এর সমাবেশ পন্ড করে দেয়া হয়। এমনকি চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পুলিশ হামলা চালিয়ে তা পন্ড করে দেয়।

এবারের সমাবেশটি বানচাল করে দেয়ার জন্যও ষড়যন্ত্র করা হয়। কৃষি গবেষণা এলাকায় অংশগ্রহণ করতে আসা লোকজনকে বাধা দেয়া হয়। সেখানে সন্ত্রাসীরা লোকজন আনতে যাওয়া গাড়িগুলো আটকায়। দুপুর বারটা পর্যন্ত ইউপিডিএফ-এর মাইক আটকিয়ে রাখে। শাপলা চত্বর থেকে র‍্যালী ফেরার সময় সন্ত্রাসীরা পুলিশের নাকের ডগায় গুলি চালায়। সমাবেশের প্রস্তুতি চলাকালে ২৯ জুলাই সন্ধ্যে দিকে দক্ষিণ খবংপুজ্যায় পিসিপি'র সাধারণ সম্পাদক প্রমেশ্বর চাকমাকে মারধর করে। গ্রামবাসীরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা ফাঁকা গুলি করে পালিয়ে যায়। সমাবেশটি ৩০ শে জুলাই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐদিন আওয়ামী লীগ হরতাল আহ্বান করলে সমাবেশটি ১ আগষ্ট পরিবর্তন করা হয়।

## প্রায় ছয় বছর পর ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসার খাগড়াছড়ি আগমণ ॥ ব্যাপক সম্বর্ধনা

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর পর ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসা খাগড়াছড়ির মাটিতে পা রাখলেন। ২১ সেপ্টেম্বর মানিকছড়িতে কয়েক হাজার ইউপিডিএফ কর্মি ও ছাত্র জনতা তাকে স্বাগত জানায়। সেখান থেকে বিশাল এক গাড়ির বহরে করে তাকে নিজ বাড়ি নারাঙহিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে তিনি বেশ কয়েকটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন। শত শত দর্শক শ্রোতা তার বক্তব্য শোনার জন্য ও তাকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমায়।

ঐদিন তার শিবমন্দির এলাকায় এক সমাবেশে বক্তব্য দেয়ার কথা ছিল। রূপক চাকমার শহীদ হওয়ার ঘটনার পর তা বাতিল করা হয়। পরদিন তিনি ঐ সমাবেশে যোগ দেন। তিনি বীরত্ব ও সাহসের সাথে সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করার জন্য ভাইবোন ছড়া ও শিবমন্দির এলাকার জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-এর উদ্যোগে যে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে তিনি সেখানে বক্তব্য রাখবেন।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা